নারায়ণদেবের কবি প্রতিভার মৌলস্বরূপ সংক্ষেপে লেখো।

ড. অচিন্ত্যকুমার গাঙ্গুলী

ডোমকল কলেজ, বাংলা বিভাগ।

পূর্ববঙ্গীয় ধারার মনসামঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন নারায়ণদেব, তিনি এই কাব্যের একজন প্রাচীন কবিই নন বাংলা ও আসামে একমাত্র তাঁর কাব্যই বিস্তার লাভ করেছে। তাঁর লেখা পদ্মাপুরানের ভূমিকা থেকে অনুমান করা সম্ভব সুকবিবল্লভ বা কবিবল্লভ তাঁর খেতাব ছিলো। নারায়ণ দেবের কাজের পুঁথি আলোচনা করলে দেখা যাবে এই কাব্যে বৈষ্ণব প্রভাব খুবই কম পড়েছে। অল্প যা কিছু বর্তমান আছে তাও লিপিকরের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয়। এর থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগেই নারায়ণদেবের কাব্য রচিত হয়েছে।

নারায়ণদেবের কাব্যে হাসান হোসেন পালার কোনও বিস্তৃত বর্ণনা নেই। এই কাব্যে এদের উল্লেখ আছে মাত্র। এই কারণে কোনও কোনও সমালোচক মনে করেন যে, বাংলাদেশে তুর্কী আক্রমণের পরে যখন তারা সর্বজনীন সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হয়নি। সেই আদি যুগেই নারায়ণদেব কাব্যটি রচনা করেন। নারায়ণদেব তাঁর কাব্যে একটি আত্মপরিচয় জ্ঞাপক শ্লোক বর্ণনা করেছেন-

“নারায়ণদেব কয় জন্ম মগধ।
মিশ্র পণ্ডিত নহে ভট্ট বিশারদ।
অতিশুদ্ধ জন্ম মোর কায়স্থের ঘর।
মৌদগোল্য গোত্র মোর গাঁই গুনাকার।।
পিতামহ উদ্ধব, নরসিংহ মোর পিতা।
মাতা মহপ্রভাকর রুক্মিণী মোর মাতা
পূর্ব পুরুষ মোর অতিশুদ্ধ মতি।
রাঢ় ত্যাজিয়া মোর বোরগ্রাম বসতি।”

নারায়ণদেব সুপণ্ডিত ছিলেন, তাঁর কাব্যপাঠেই জানা যায়। তিনি সংস্কৃত পুরাণের আশ্রয় নিয়েছেন। নারায়ণদেব বাঙালী পূর্ব-সূরীদের চেয়ে সংস্কৃত পুরাণের বেশি অনুসরণ করেছেন। তাঁর গ্রন্থের শ্লোক থেকে এ কথা সহজে বোঝা যায়।

"মুনিমুখে শুনিয়াছি সৃষ্টির পত্তন।
পদ্মাপুরাণ কথা শুন জ্ঞানিজন।"

নারায়ণদেব লৌকিক মঙ্গলকাব্য রচনা করলেও কাব্যের আদর্শ রূপ তখনকার দিনে প্রচলিত না থাকায় তার কাব্যের গতি শ্লথ হয়ে পড়েছে। নারায়ণদেবের কাব্য দেবখণ্ড সমধিক প্রাধান্য লাভ করেছে। এই খন্ডের রচনার কবি পুরাণ শাস্ত্র অত্যাধিক নির্ভরশীল ছিলেন। বিশেষ করে শৈবপুরাণ, মহাভারত, কালিদাসের কুমারসম্ভবের অনুসরণ করেছেন। হরপার্বতীর লীলার অনেক জায়গা জুড়ে রয়েছে কুমারসম্ভবের প্রত্যক্ষ প্রভাব।

তাঁর নরখন্ড অসংলগ্ন হলেও অভিনবত্বের দাবী করে। তাঁর রচনার কাব্যরস অত্যন্ত সরল ও সাবলীল। গতানুগতিকের বাইরে এসে কবি মৌলিকত্বের ছাপ রাখেন তাঁর কাব্যে। মনসা অত্যাচারী রাজশক্তির প্রতীক। নারায়ণদেবের কাব্যের নায়ক চন্দ্রধর। অত্যাচারী জনগণের প্রতিভূ হিসেবে সে বিরাজিত। শুধু এই নারায়ণদেবের কাব্যেই চাঁদ সদাগর পূর্ণ মানবতার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। আস্থাশীল চাঁদ সদাগর মধ্যযুগের সংগ্রামী ও প্রতিবাদী আদিম মানবসত্ত্বার সাক্ষ্য বহন করছে। শুধু চাঁদের চরিত্র বর্ণনাতেই নয় ব্যক্তিত্বময়ী বেহুলার চরিত্রেও তিনি যে সতীত্বের সংমিশ্রণ ঘটান আর কোনও মনসা মঙ্গলের কবির পক্ষে সম্ভব হয়নি। বিশিষ্ট সমালোচক পণ্ডিত ড. ভূদেব চৌধুরী মতে-

"লাঞ্ছিত মানবিক চেতনার সর্বময় বিক্ষোভের
পরিণাম হিসেবেই চন্দ্রধর ও বেহুলা চরিত্রের
উদ্ভব কল্পনা করা হয়েছে। সেই নিগৃহীত
ক্ষুদ্র মনুষ্যত্ব স্বভাবসিদ্ধ অভিব্যক্তি পেয়েছে
নারায়ণদেবের কাব্যে। কোন প্রকার সচেতন
শিল্পীর চেষ্টা এতে লক্ষ করা যায় না।"

তীক্ষ্ম-ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে তিনি মধ্যযুগীয় সাহিত্য যে হাস্যরস সৃষ্টি করেন তার তুলনা মেলা সত্যিই ভার। যেমন ডোমনি চন্ডীর মহাদেবের প্রতি ব্যঙ্গাত্মক উক্তি প্রবাদে পরিণত হয়েছে-

" বানরের মুখে যেন ঝুনা নারিকেল।
কাকের মুখেতে যেন দিব্য পাকাবেল।"

তৎকালীন সমাজের সম্ভ্রান্ত বণিক শ্রেণিকেও তিনি ব্যঙ্গের হুল ফোটাতে নিস্তার দেননি। যদিও তাঁর ব্যবহৃত ব্যঙ্গের ভাষা খুবই প্রাচীন। তবুও সঠিক স্থানে সঠিক ভাবে তিনি ব্যঙ্গ বর্ষণ করতে কার্পণ্য করেন নি। তাই পূর্ব থেকে পশ্চিম জুড়ে তিনি মনসামঙ্গলের কাব্যের রচয়িতা হিসেবে বিশিষ্ট কবি।